চিরায়ত বই

২৮

চরিত্রহীন

চরিত্রহীন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

KOBI PROKASHANI

চরিত্রহীন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকাল

কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৪

প্রকাশক

সজল আহমেদ

কবি প্রকাশনী

৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট

২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ

শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস

৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৫৭৫ টাকা

Choritrohin A novel by Sarat Chandra Chattopadhyay Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: June 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 575 Taka RS: 575 US$ 30
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98111-2-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

প্রসঙ্গ-কথা

শরৎচন্দ্রের *চরিত্রহীন* উপন্যাসটি প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর তারিখে। প্রকাশ করেন এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স।

চরিত্রহীন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৩২০ সালের কার্তিক—চৈত্র এবং ১৩২১ সালেও কয়েক মাস 'যমুনা' পত্রিকায় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

চরিত্রহীন ১৩২০ সালের কার্তিক সংখ্যা যমুনায় প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু হলেও, এ বইয়ের অন্তত অনেকটাই বহু আগের লেখা। নানা পরোক্ষ ইঙ্গিত থেকে জানা যায় যে ১৯০১/২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই উপন্যাসের অংশবিশেষ লেখা হয়ে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। তারপর শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে ১৯১১/১২ খ্রিস্টাব্দে আবার এটি লিখতে শুরু করেন। ৫০০ পাতা লিখে বই যখন শেষ করে আনেন, সেই সময় তিনি রেঙ্গুনে যে কাঠের বাড়ির দোতলায় থাকতেন, সেই বাড়ির নিচের তলায় ৫-২-১২ তারিখে আগুন লাগে। ফলে বহু জিনিসপত্রের সঙ্গে *চরিত্রহীন*-এর পাণ্ডুলিপিটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এই সময় শরৎচন্দ্র বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং চরিত্রহীন উপন্যাসের manuscript...' তিনি পুনরায় এটি লিখতে শুরু করেন এবং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন অফিসে ছুটি নিয়ে দেশে আসেন, তখন ঐ অসমাপ্ত *চরিত্রহীন*-এর পাণ্ডুলিপিটি সঙ্গে এনেছিলেন এবং দেশে এসে হাওড়া শহরে থাকাকালেও *চরিত্রহীন* লিখতেন।

এই সময়েই শরৎচন্দ্রের অন্যতম মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফত শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের পরিচয় হয়।

ফণীবাবু তাঁর 'যমুনা' পত্রিকায় ছাপাবার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে *চরিত্রহীন* চান। শরৎচন্দ্র ফণীবাবুর অনুরোধে তাঁকে দেবেন বলে কথা দেন। পরে রেঙ্গুনে গিয়ে ফণীবাবুকে এক চিঠিতে লেখেন—

'আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার লোভ, কেহ সম্মানের লোভ, কেহ বা দুই-ই, কেহ বা বন্ধুত্বের অনুরোধও করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি, আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।

... গুরুদাসবাবুর পুত্র তাঁহার নতুন কাগজের জন্য আমার লেখার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, অবশ্য আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমথর খাতিরে, কিন্তু ঐ কথা আমার।'

এই চিঠির গুরুদাসবাবুর পুত্র হলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং বন্ধু প্রমথ হলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। প্রমথবাবু ছিলেন 'ভারতবর্ষ' কাগজের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা।

১৩৪৪ সালের ১৫ ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্র তাঁর পুস্তকের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'... চন্দ্রনাথ ও অরক্ষণীয়া পেলাম। শীঘ্র সংশোধন করে দেবো।'

শরৎচন্দ্র চন্দ্রনাথ সংশোধন করে দেবার সময় ঐ বইয়ের একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সেই ভূমিকাটি এই—

'চন্দ্রনাথ গল্পটি আমার বাল্য-রচনা। তখনকার দিনে গল্পে-উপন্যাসে কথোপকথনের সে-ভাষা ব্যবহার করা হইত, এই বইখানিতে সেই ভাষায়ই ছিল। বর্তমান সংস্করণে মাত্র ইহাই পরিবর্তিত করিয়া দিলাম। ইতি ১৮ই আশ্বিন, ১৩৪৪

গ্রন্থকার।'

গ্রন্থকারের এই ভূমিকাটি তখন চন্দ্রনাথের সংশোধিত চতুর্দশ সংস্করণে ছাপা হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু তারিখ ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ।

প্রকাশকের কাছে লেখা শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি থেকে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও তাঁর বই সংশোধন করে দিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর *চন্দ্রনাথ*-এর মতো বইয়ে শুধু বাল্য-রচনা সংশোধনই নয়, কোনো কোনো বইয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন এবং সংযোজনও করেছেন। আর অবশ্য সেই সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের মুদ্রণ-প্রমাদগুলোও সংশোধন করে দিয়েছেন—যেমন—*দত্তা* উপন্যাস ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশের সময় তিনি *দত্তা*র পঞ্চম সংস্করণের ওপর ভুল সংশোধন তো করেছিলেনই, কিছু পরিবর্তনও করেছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *দত্তা*র ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকায় তাই শরৎচন্দ্র বিজ্ঞাপন হিসাবে লিখেছিলেন—

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আলস্য ও অনবধানতায় পূর্বেকার সংস্করণে অনেক ভুল-চুক ছিল। এবার নিজে দেখিয়া যথাশক্তি সংশোধন করিয়া দিলাম। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু কিছু পরিবর্তন করিতেও হইয়াছে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র *দত্তা*র ন্যায় তাঁর অন্যান্য বইয়েও পরে সংযোজন ও পরিবর্তন করেছেন।

শরৎচন্দ্রের বহু বইয়ের প্রথম সংস্করণ আমরা সংগ্রহ করেছি। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর অনেক বইয়েরই এক-এক সময়ে, এমনকি জীবনের শেষ সময়েও পরিবর্তন করেছিলেন বলে, ঐ-সব প্রথম সংস্করণ গ্রন্থগুলোর ওপর আমরা তেমন নির্ভরশীল হইনি। আমরা সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি তাঁর শেষ-বয়সে প্রকাশিত গ্রন্থ-সংস্করণগুলোর ওপর। তবে তিনি যেসব বই সংশোধন করে যেতে পারেননি, বা অপ্রয়োজন ভেবে করেননি, সেরূপ ক্ষেত্রে আমরা তাঁর প্রথম সংস্করণের গ্রন্থগুলোকেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেছি।

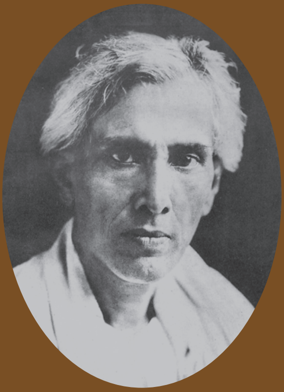

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ সালে হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম। তাঁর বাল্য-কৈশোর কাটে ভাগলপুরে। শরৎচন্দ্র এফ.এ. পরীক্ষা দিতে পারেননি। তাঁর বিধিমত লেখাপড়া এখানেই শেষ। ভারতবর্ষের নানাস্থানে তিনি ঘুরেছেন, ভাগ্যান্বেষণে তিনি ব্রহ্মদেশে যান এবং বারো-তেরো বৎসর রেঙ্গুনে কেরানিগিরি করেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে—বৈশাখ আষাঢ় সংখ্যার ভারতীতে 'বড়দিদি' নামক গল্প প্রকাশিত হবার পর তিনি রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পাঠক সমাজে সুপরিচিত হন।

শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক, যদিও কয়েকটি ছোটগল্প এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ *বড়দিদি* (১৯১৩)। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে *বিরাজ বৌ* (১৯১৪), *বিন্দুর ছেলে* (১৯১৪), *পরিণীতা* (১৯১৪), *পণ্ডিতমশাই* (১৯১৪), *মেজদিদি* (১৯১৫), *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *শ্রীকান্ত* (১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য় খণ্ড ১৯১৮, ৩য় খণ্ড ১৯২৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৩৩), *দেবদাস* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *গৃহদাহ* (১৯২০), *পথের দাবী*, *শেষপ্রশ্ন* (১৯৩১) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থই অসামান্য জনপ্রিয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক।

১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এক

পশ্চিমের একটা বড় শহরে এই সময়টায় শীত পড়ি-পড়ি করিতেছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণের এক চেলা কি-একটা সৎকর্মের সাহায্যকল্পে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে এই শহরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারই বক্তৃতা-সভায় উপেন্দ্রকে সভাপতি হইতে হইবে এবং তৎপদমর্যাদানুসারে যাহা কর্তব্য তাহারও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই প্রস্তাব লইয়া একদিন সকালবেলায় কলেজের ছাত্রের দল উপেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সৎকর্মটা কি শুনি?

তাহারা কহিল, সেটা এখনো ঠিক জানা নাই। স্বামীজী বলিয়াছেন, ইহাই তিনি আহূত সভায় বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিবেন এবং সভার আয়োজন ও প্রয়োজন অনেকটা এইজন্যই।

উপেন্দ্র আর কোন প্রশ্ন না করিয়াই রাজী হইলেন। এটা তাঁহার অভ্যাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি এতই ভাল করিয়া পাস করিয়াছিলেন যে, ছাত্রমহলে তাঁহার শ্রদ্ধা ও সম্মানের অবধি ছিল না। ইহা তিনি জানিতেন। তাই, কাজে-কর্মে, আপদে-বিপদে তাহারা যখনই আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের আবেদন ও উপরোধকে মমতায় কোনদিন উপেক্ষা করিয়া ফিরাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীকে ডিঙ্গাইয়া আদালতের লক্ষ্মীর সেবায় নিযুক্ত হইবার পরও ছেলেদের জিম্‌ন্যাস্টিকের আখড়া হইতে ফুটবল, ক্রিকেট ও ডিবেটিং ক্লাবের সেই উঁচু স্থানটিতে গিয়া পূর্বের মত তাঁহাকে বসিতে হইত।

কিন্তু এই জায়গাটিতে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না—কিছু বলা আবশ্যক। একজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিছু বলা চাই ত হে! সভাপতি সেজে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকা ত আমার কাছে ভাল ঠেকে না—কি বল তোমরা?

এ ত ঠিক কথা। কিন্তু তাহাদের কাহারো কিছুই জানা ছিল না। বাহিরের প্রাঙ্গণের একধারে একটা প্রাচীন পুষ্পিত জবা বৃক্ষের তলায় এই ছেলের দলটি যখন উপেন্দ্রকে মাঝখানে লইয়া সংসারের যাবতীয় সম্ভব-অসম্ভব সৎকর্মাবলীর তালিকা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দিবাকরের ঘর হইতে একজন নিঃশব্দে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। উপেন্দ্র দিবাকরের মামাতো ভাই। শিশু অবস্থায় দিবাকর মাতৃ-

পিতৃহীন হইয়া মামার বাড়িতে মানুষ হইতেছিল। বাহিরের একটি ছোট ঘরে দিনের বেলায় তাহার লেখাপড়া এবং রাত্রে শয়ন চলিত। বয়স প্রায় উনিশ; এফ. এ. পাস করিয়া বি. এ. পড়িতেছিল।

উপেন্দ্রর দৃষ্টি এই পলাতকের উপর পড়িবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, সতীশ, চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিস যে! এদিকে আয়—এদিকে আয়!

ধরা পড়িয়া সতীশ অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন দেখিনি যে?

অপ্রতিভ ভাবটা সারিয়া লইয়া সতীশ হাসিমুখে বলিল, এতদিন এখানে ছিলাম না উপীনদা, এলাহাবাদে কাকার কাছে গিয়েছিলাম।

কথাটা ভাল করিয়া শেষ না হইতেই একজন ছাঁটা-দাড়ি টেরি-চশমাধারী যুবক চোখ টিপিয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিয়া বসিল, মনের দুঃখে নাকি সতীশ?

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবারেও তাহাকে পাঠানো হয় নাই এ সংবাদ সকলেই জানিত, তাই কথাটা এমন বেয়াড়া বিশ্রী শুনাইল যে, উপস্থিত সকলেই লজ্জায় মুখ নত করিয়া মনে মনে ছি ছি করিতে লাগিল। যুবকটির পরিহাস ও দাঁতের হাসি কোথাও আশ্রয় না পাইয়া তখনি মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু সতীশ তাহার হাসিমুখ লইয়া বলিল, ভূপতিবাবু, মন থাকলেই মনে দুঃখ হয়। পাস করার আশাই বলুন আর ইচ্ছেই বলুন, আমার ভাল করে জ্ঞান হবার পর থেকেই ছেড়েছি। শুধু বাবা ছাড়তে পারেননি। তাই, মনের দুঃখে কাউকে দেশান্তরী হতে হলে তাঁর হওয়াই উচিত ছিল; অথচ তিনি দিব্যি অটল হয়ে তাঁর ওকালতি করে গেলেন। কিন্তু যা বল উপীনদা, এবারে তাঁরও চোখ ফুটেছে।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। হাসির কথা ইহাতে ছিল না, কিন্তু এই ভূপতিবাবুর অভদ্র পরিহাস যে সতীশকে ক্ষুণ্ন করিতে পারে নাই, ইহাতেই সকলে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল।

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, এবারে তা হলে তুই ছেড়ে দিলি?

সতীশ বলিল, আমি কি কোনদিন ধরেছিলাম যে আজ ছেড়ে দেব? আমি কোনদিন ধরিনি উপীনদা, লেখাপড়া আমাকে ধরেছিল। এবারে আমি আত্মরক্ষা করব। এমন দেশে গিয়ে বাস করব যেখানে পাঠশালাটি পর্যন্ত নেই।

উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু কিছু করা ত দরকার। মানুষে একেবারে চুপ করে থাকতেও পারে না, পারা উচিতও নয়।

সতীশ বলিল, না, চুপ করে থাকব না। এলাহাবাদ থেকে একটা নূতন মতলব পেয়ে এসেছি। একবার ভাল করে চেষ্টা করে দেখব সেটার কি করতে পারি।

বিস্তারিত বিবরণের আশায় সকলে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে সলজ্জ হাস্যে বলিল, আমাদের গাঁয়ে যেমন ম্যালেরিয়া, তেমনি ওলাউঠা। পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে সময়ে হয়ত একজনও ডাক্তার পাওয়া যায় না। আমি সেইখানে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করে দেব। আমার মা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমাকে হাজার-কয়েক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে টাকা আমার কাছেই আছে। ঐ দিয়ে আমাদের দেশের বাড়ির বৈঠকখানাঘরে ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে দেব। তুমি হেসো না উপীনদা, তুমি নিশ্চয় দেখো, এ আমি করব। বাবাকেও সম্মত করেছি। তাঁকে বলেছি, মাস-খানেক পরেই কলকাতা গিয়ে হোমিওপ্যাথি স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মাস-খানেক পরে কেন?

সতীশ বলিল, একটু কাজ আছে। দক্ষিণপাড়া নবনাট্যসমাজ ভেঙ্গে একটা ফ্যাকড়া বার হয়ে গেছে, আমাদের বিপিনবাবু হয়েছেন ওই দলের কর্তা। টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ করে তিনিই আমাকে এনেছেন, আমি কথা দিয়েছি তাঁদের কনসার্ট পার্টি ঠিক করে দিয়ে তবে অন্য কাজে হাত দেব।

শুনিয়া সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সতীশও হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ উচ্চহাসি মৃদু হইয়া আসিলে সতীশ বলিল, একটা বাঁশীর অভাব হচ্ছে, সেইজন্যেই আজ দিবাকরের কাছে এসেছিলাম। যদি থিয়েটারের রাতটায় আমাকে উদ্ধার করে দেয় ত আর বেশী ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয় না।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলে ও?

সতীশ বলিল, আর কি বলবে—পরীক্ষা সন্নিকট। এটা আমার মাথাতে ঢোকে না উপীনদা, দুই বছরের পড়াশুনার পরীক্ষা কেমন করে লোকের একটা রাতের অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। আমি বলি, যাদের সত্যিই যায় তাদের যাওয়াই উচিত। এমন পাস করার মর্যাদা যাদের কাছে থাকে থাক আমার কাছে ত নেই। তুমি রাগ করতে পারবে না উপীনদা, আমি তোমাকে যত জানি এঁরা তার সিকিও জানেন না। জিমন্যাস্টিকের আখড়া থেকে ফুটবল ক্রিকেটে চিরদিন তোমার সাক্‌রেদি করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, অনেকদিন অনেক রকমেই তোমার সময় নষ্ট হতে দেখেছি, অনেকগুলো পরীক্ষা দিতেও দেখলাম, সেগুলো রীতিমত স্কলারশিপ নিয়ে পাস করতেও দেখলাম, কিন্তু কোনদিন তোমাকে ত একজামিনের দোহাই পাড়তে শুনলাম না।

উপেন্দ্র কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, আমি যে বাঁশী বাজাতে জানিনে সতীশ।

সতীশ বলিল, আমিও অনেক সময়ে ওই কথাই ভাবি। সংসারের এই জিনিসটা কেন যে তুমি জানলে না, আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু সে কথা যাক—তোমাদের দুপুর রোদের এ কমিটিটি কিসের?

শীতের রৌদ্র পিঠে করিয়া মাথায় র‍্যাপার জড়াইয়া ইহাদের এই বৈঠকটি দিব্যি জমিয়া উঠিয়াছিল। বেলা যে এত বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কেহই নজর করে নাই। সতীশের কথায় বেলার দিকে চাহিয়া সকলেই এককালে চিন্তিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সভাভঙ্গের মুখে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, উপেন্দ্রবাবু তা হলে?

উপেন্দ্র বলিলেন, আমি ত বলেছি, আমার আপত্তি নেই। তবে তোমাদের স্বামীজীর উদ্দেশ্যটা যদি পূর্বাহ্নে একটু জানা যেত ত ভারী স্বস্তি পেতাম। নিতান্ত বোকার মত কোথাও যেতে বাধবাধ ঠেকে।

ভূপতি কহিল, কিন্তু কোন কথাই তিনি বলেন না। বরং এমনও বলেন, যাহা জটিল ও দুর্বোধ্য, তাহা বিশদভাবে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিবার সময় ও সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত একেবারে না বলাই ভাল। ইহাতে অধিকাংশ সময়ে সুফলের পরিবর্তে কুফলই ফলে।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। এতক্ষণে সকলেই বাহির হইয়া রাস্তার একধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ ধরিয়া বসিল, ব্যাপারটা কি উপীনদা?

উপেন্দ্রকে বাধা দিয়া ভূপতি কহিল, সতীশবাবু, আপনাকেও চাঁদার খাতায় সই করতে হবে। কেন, এখন আমরা ঠিক করে বলতে পারব না। পরশু অপরাহ্নে কলেজের হলে স্বামীজী নিজেই বুঝিয়ে বলবেন।

সতীশ বলিল, তা হলে আমার বোঝা হল না ভূপতিবাবু। পরশু আমাদের পুরো রিয়ার্সেল—আমি অনুপস্থিত থাকলে চলবে না।

ভূপতি আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি সতীশবাবু! থিয়েটারের সামান্য ক্ষতির ভয়ে এরূপ মহৎ কাজে যোগ দেবেন না? লোকে শুনলে বলবে কি?

সতীশ কহিল, লোকে না শুনেও অনেক কথা বলে—সে কথা নয়। কথা আপনাদের নিয়ে। কিছু না জেনেও এই অনুষ্ঠানটিকে আপনারা যতটা মহৎ বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পেরেছেন, আমি যদি ততটা না পারি ত আমাকে দোষ দেবেন না। বরং যা জানি, যার ভালমন্দ কিসে হয় না হয় বুঝি, সেটা উপেক্ষা করে, তার ক্ষতি করে একটা অনিশ্চিত মহত্ত্বের পিছনে ছুটে বেড়ানো আমার কাছে ভাল ঠেকে না।

উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বয়সে এবং লেখাপড়ায় ভূপতিই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনি কথা বলিতেছিলেন। সতীশের কথায় হাসিয়া বলিলেন, সতীশবাবু, স্বামীজীর মত মহৎ ব্যক্তি যে ভাল কথাই বলবেন, তাঁর উদ্দেশ্য যে ভালই হবে, এ বিশ্বাস করা ত শক্ত নয়।

সতীশ বলিল, ব্যক্তিবিশেষের কাছে শক্ত নয় মানি। এই দেখুন না, এন্ট্রান্স পাস করাও শক্ত কাজ নয়, অথচ, পাস করা দূরে থাক, তিন-চার

বছরের মধ্যে আমি তার কাছে ঘেঁষতে পারলাম না। আচ্ছা, এই স্বামীজী লোকটিকে পূর্বে কখনও দেখেছেন কিংবা এঁর সম্বন্ধে কোনদিন কিছু শুনেছেন?

কেহই কিছু জানে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিল।

সতীশ বলিল, এই দেখুন, এক গেরুয়া বসন ছাড়া আর তাঁর কোন সার্টিফিকেট নেই। অথচ আপনারা মেতে উঠেছেন এবং আমি নিজে কাজ ক্ষতি করে তাঁর বক্তৃতা শুনতে পারিনে বলে সবাই রাগ করছেন।

ভূপতি বলিল, মেতে উঠি কি সাধে সতীশবাবু! এই গেরুয়া কাপড়-পরা লোকগুলি সংসারকে যে অনেক জিনিসই দিয়ে গেছেন। সে যাই হোক, আমি রাগ করিনি, দুঃখ করছি। জগতের সমস্ত বস্তুই সাফাই সাক্ষীর হাত ধরে হাজির হতে পারে না বলে মিথ্যা বলে ত্যাগ করতে হলে অনেক ভাল জিনিস হতেই আমাদের বঞ্চিত হয়ে থাকতে হয়। আপনিই বলুন দেখি, যখন সঙ্গীতের সা-রে-গা-মা সাধতেন, তখন কতটুকু রসের আস্বাদ পেয়েছিলেন? কতটুকু ভালমন্দ তার বুঝেছিলেন?

সতীশ কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলছি। সঙ্গীতের একটা আদর্শ যদি আমার সুমুখে না থাকত, মিষ্ট রসাস্বাদের আশা যদি না করতাম, তা হলে এত কষ্ট করে সা-রে-গা-মা সাধতাম না। ওকালতির মধ্যে টাকার গন্ধ আপনি যদি অত করে না পেতেন, তা হলে একবার ফেল করেই ক্ষান্ত দিতেন, বারংবার এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করে আইনের বইগুলো মুখস্থ করতেন না। উপীনদাও হয়ত একটা ইস্কুল-মাস্টারি নিয়ে এতদিন সন্তুষ্ট হয়ে থাকতেন।

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ভূপতির মুখ লাল হইয়া উঠিল। একগুণ খোঁচা যে দশগুণ করিয়া সতীশ ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহা উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিল।

রোষ চাপিয়া রাখিয়া ভূপতি কহিলেন, আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। একটা জিনিসের ভালমন্দ যে কত রকমে প্রমাণ হতে পারে, তাই হয়ত আপনি জানেন না।

কথায় কথায় সকলেই ক্রমশ রাস্তার একধারে উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, মাপ করুন ভূপতিবাবু! ছয় রকম 'প্রমাণ' ও ছত্রিশ রকম 'প্রত্যক্ষে'র আলোচনা এত রোদে সহ্য হবে না। তার চেয়ে বরং সন্ধ্যার পর বাবার বৈঠকখানায় যাবেন, যেখানে দুপুর-রাত্রি পর্যন্ত কালোয়াতি তর্ক হতে পারবে। প্রফেসার নবীনবাবু, সদর-আলা গোবিন্দবাবু, মায় এ-বাড়ির ভট্‌চায্যিমশায় পর্যন্ত এই নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চুলোচুলি করতে থাকেন। পাশের ঘরেই আমার আড্ডা। হেরফেরগুলো বেশ কায়দা করে এখনও পেকে উঠেনি বটে, কিন্তু গায়ে আমার রং ধরেচে। অসময়ে পেকে গাছতলায় পড়ে শিয়াল-কুকুরের

পেটে যেতে চাইনে। তাই, এটা বাদ দিয়ে আর কিছু যদি বলবার থাকে ত বলুন, না হয় অনুমতি করুন, বিদায় হই।

যুক্তহস্ত সতীশের কথার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। রুষ্ট ভূপতি দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় তর্কের সূত্র হারাইয়া গেল এবং এমন অবস্থায় যাহা প্রথমেই মুখে আসে তাহাই তর্জন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—আপনি তা হলে দেখছি ঈশ্বরও মানেন না।

কথাটা যে নিতান্তই অসংলগ্ন ও ছেলেমানুষের মত হইল, তাহা ভূপতির নিজের কানেও ঠেকিল।

সতীশ ভূপতির আরক্ত মুখের উপরে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া উপেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ও উপীনদা, ভূপতিবাবু এবারে কোণ নিয়েচেন। আমার মত দশ-বারোটা কুকুরেও এবারে আর ঘেঁষতে পারবে না। ভূপতির প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক করেছেন ভূপতিবাবু, 'চোর-চোর' খেলায় ছুটতে না পারলে বুড়ি ছুঁয়ে ফেলাই ভাল।

এই অপবাদের আঘাতে আগুন হইয়া ভূপতি উঠিয়া দাঁড়াইতেই উপেন্দ্র হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি চুপ কর ভূপতি, আমি এই লোকটিকে জব্দ কচ্ছি। বুড়ি ছোঁয়া, কোণ নেওয়া, এ-সব কি কথা রে সতীশ? বাস্তবিক তোর যেরূপ সন্দিগ্ধ প্রকৃতি, তাতে সন্দেহ হতেই পারে, তুই ঈশ্বর পর্যন্ত মানিসনে।

সতীশ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট! ঈশ্বর মানিনে? ভয়ঙ্কর মানি। থিয়েটারের আড্ডা ভাঙ্গবার পরে দুপুর-রাত্রে গোরস্থানের পাশ দিয়ে একলা ফিরবার পথে যখন বিশ্বাসের জোরে বুকের রক্ত বরফ হয়ে যায়, তোমরা ভালমানুষের দল তার কি খবর রাখ? হাসছ কি উপীনদা, ভূত-প্রেত মানি, আর ঈশ্বর মানিনে?

তাহার কথায় ক্রুদ্ধ ভূপতি পর্যন্ত হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, সতীশবাবু, ভূতের ভয় করলেই ঈশ্বর স্বীকার করা হয়—এ দুটি কি তবে আপনার কাছে এক?

সতীশ বলিল, একেবারে এক। পাশাপাশি রাখলে চেনবার জো নেই। শুধু আমার কাছেই নয়, আপনার কাছেও বটে, উপীনদার কাছেও বটে, এবং যাঁরা শাস্ত্র লেখেন তাঁদের কাছেও বটে। ও এক কথাই। না মানেন ত বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু মানলে আর রক্ষা নেই। দায়ে-ঘায়ে, আপদে-বিপদে, অনেক তরফ দিয়ে অনেক রকম করে ভেবে দেখেছি, বাগ্‌বিতণ্ডাও বিস্তর শুনেছি, কিন্তু যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। ছোট একটুখানি নিরাকার ব্রহ্মই মানো, আর হাত-পা-ওয়ালা তেত্রিশ কোটি দেবতাই স্বীকার কর, কোন ফন্দিই খাটে না। সমস্ত এক শিকলে বাঁধা। একটিকে টান দিলেই সব এসে হাজির হবে। ওই স্বর্গ-নরক আসবে, ইহকাল-পরকাল আসবে, অমর আত্মা

এসে পড়বে, তখন কবরস্থানের দেবতাগুলিকে ঠেকাবে কি দিয়ে? কালীঘাটের কাঙালীর মত? সাধ্য কি তোমার একজনকে চুপি চুপি কিছু দিয়ে পরিত্রাণ পাও! নিমেষের মধ্যে যে যেখানে আছেন এসে ঘিরে ধরবেন। ঈশ্বর মানি, আর ভূতের ভয় করিনে—সে হবার জো নেই ভূপতিবাবু!

যেরূপ ভঙ্গী করিয়া সে কথার উপসংহার করিল তাহাতে সকলেই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। অপেক্ষাকৃত লঘুবয়স্ক দুইজন বালকের হাস্য-কোলাহলে রবিবারের অলস মধ্যাহ্ন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রর স্ত্রী সুরবালার প্রেরিত যে চাকরটা দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ বিড়বিড় করিতেছিল, সে পর্যন্ত মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কলহের যে মেঘখানা ইতিপূর্বে আকার ধারণ করিতেছিল, এই সমস্ত হাসির ঝড়ে তাহা কোথায় উড়িয়া গেল তাহার উদ্দেশ রহিল না।

কেহই হুঁশ করিল না, দ্বিপ্রহর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এতক্ষণে বাড়ির ভিতরে ক্ষুৎপিপাসাতুর ঝি-র দল উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিতেছে ও রান্নাঘরে বামুনঠাকুরেরা কর্মত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া দিতেছে।

দুই

মাস-তিনেক পরে কলিকাতার একটা বাসায় একদিন সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া সতীশ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে হঠাৎ স্থির করিয়া বসিল, আজ সে স্কুলে যাইবে না। সে হোমিওপ্যাথি স্কুলে পড়িতেছিল। এই কামাই করিবার সঙ্কল্পটা তাহার মনের মধ্যে সুধা বর্ষণ করিল এবং মুহূর্তের মধ্যে বিকল দেহটাকে সবল করিয়া তুলিল। সে প্রফুল্ল মুখে উঠিয়া বসিয়া তামাকের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিল সাবিত্রী। সে অনতিদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙ্গলো বাবু?

সাবিত্রী বাসার ঝি এবং গৃহিণী। চুরি করিত না বলিয়া খরচের টাকাকড়ি সমস্তই তাহার হাতে। একহারা অতি সুশ্রী গঠন। বয়স বোধ করি একুশ-বাইশের কাছাকাছি, কিন্তু মুখ দেখিয়া যেন আরও কম বলিয়া মনে হয়। সাবিত্রী ফরসা কাপড় পরিত এবং ঠোঁট-দুটি পান ও দোক্তার রসে দিবারাত্রি রাঙ্গা করিয়া রাখিত। সে হাসিয়া কথা কহিতে যেমন জানিত, সে হাসির দামটিও ঠিক তেমনি বুঝিত। গৃহসুখ-বঞ্চিত বাসার সকলের উপরই তাহার একটা আন্তরিক স্নেহ-মমতা ছিল। অথচ, কেহ সুখ্যাতি করিলে বলিত, যত্ন না করলে আপনারা রাখবেন কেন বাবু! তা ছাড়া, বাড়ি গিয়ে গিন্নীদের কাছে নিন্দে করে বলবেন, বাসার এমন ঝি যে, পেট ভরে দুবেলা

খেতেও দেয় না—ও অপযশের চেয়ে একটু খাটা ভাল, বলিয়া হাসিমুখে কাজে চলিয়া যাইত। বাসার মধ্যে শুধু সতীশই তাহার নাম ধরিয়া ডাকিত। যা-তা পরিহাস করিত এবং যখন-তখন বকশিশ দিত। সতীশের উপর তাহার স্নেহটা কিছু অতিরিক্ত ছিল। সারা দিন সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে বোধ করি এইজন্যই সে তাহার একটি চোখ এবং একটি কান এই উন্নত বলিষ্ঠ চারুদর্শন যুবকটির উদ্দেশে নিযুক্ত রাখিত। বাসার সকলেই ইহা জানিত, এবং কেহ কেহ সকৌতুক ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িত না। সাবিত্রী জবাব দিত না, মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজে চলিয়া যাইত।

সতীশ কহিল, হাঁ, ঘুম ভাঙ্গলো। বলিয়াই বালিশের তলা হইতে একটা টাকা ঠং করিয়া ফেলিয়া দিল।

সাবিত্রী টাকাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, সকালবেলায় আবার কি আনতে হবে?

সতীশ বলিল, সন্দেশ! কিন্তু আমার জন্যে নয়। এখন রেখে দাও, রাত্রে তোমার বাবুর জন্যে কিনে নিয়ে যেও।

সাবিত্রী রাগ করিয়া টাকাটা বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, রেখে দিন আপনার টাকা। আমার বাবু সন্দেশ খেতে ভালবাসে না।

সতীশ টাকাটা পুনরায় ফেলিয়া অনুনয়ের স্বরে কহিল, আমার মাথা খাও সাবিত্রী, এ টাকা আমাকে কিছুতেই ফিরুতে পারবে না, আমি সত্যি তোমার বাবুকে সন্দেশ খেতে দিয়েছি।

সাবিত্রী মুখ ভার করিয়া বলিল, যখন-তখন আপনি মেয়েমানুষের মত মাথার দিব্যি দেন, এ ভারী অন্যায়। বাবু-টাবু আমার নেই। বাবু আমার আপনি—আপনারা।

সতীশ হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, দাও টাকা। কিন্তু বল, আমরা ছাড়া যদি আর কোন বাবু থাকে ত তার মাথা খাই।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আমার বাবু কি আপনার সতীন যে, মাথা খাচ্ছেন?

সতীশ কহিল, আমি তাঁর মাথা খাচ্ছি, না তিনি আমার খাচ্ছেন? আমি ত বরং তাঁকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছি!

সাবিত্রী মুখ ফিরাইয়া হাসি দমন করিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, চাকর-দাসীর সঙ্গে এ-রকম করে কথা কইলে ছোটলোক প্রশ্রয় পেয়ে যায়, আর মানে না, একটু বুঝে সমঝে কথা কইতে হয় বাবু, নইলে লোকেও নিন্দা করে। বলিয়া টাকাটা তুলিয়া লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ এ বেলা কি রান্না হবে?

রন্ধনশালা সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে সতীশ যে একজন গুণী লোক সে পরিচয় সাবিত্রী পূর্বেই পাইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যহ সকালবেলা একবার করিয়া আসিয়া সতীশের হুকুম লইয়া যাইত, এবং নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া